বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীঃ সাংবিধানিকতা ও গণতন্ত্রের প্রশ্ন

হাসান উজ্জামান*

সার–সংক্ষেপ ঃ *১৯৭২ সালের মূল বাংলাদেশ সংবিধান এবং এর সংশোধনীগুলো নিয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য গবেষণাধর্মী আলোচনা আজ অবধি লক্ষণীয় নয়।* [১] *এই সংবিধানকে এর দ্বিতীয় সংশোধনীর প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে পুরো রাষ্ট্র কাঠামো ও রাজনীতিক ব্যবস্থার পরিমন্ডলে সাংবিধানিকতা ও গণতন্ত্রের প্রশ্ন উত্থাপনপূর্বক বিশ্লেষণধর্মী সামগ্রিক আলোচনার সূত্রপাত করাই হচ্ছে বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের আরাধ্য সাংবিধানিকতা ও গণতন্ত্র ১৯৭৩ সালে কৃত বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে কিভাবে সকল মাত্রায়, সার্বিকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে, কিভাবে তা অসাংবিধানিকতা, অধিকারহীনতা ও গণতন্ত্রহীনতাকে নিষ্ঠুরতম বাস্তবতায় পরিণত করেছে, কিভাবে তা বিদ্যমান শোষণভিত্তিক, অসম, উনজন–নির্ভর আর্থনীতিক কাঠামোর অধিকতর টিকে থাকার ও জঙ্গমতার অনুকূলে গেছে, কিভাবে তা পরবর্তীতে গণবিচ্ছিন্ন সামরিক–আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, লুটেরা পুঁজি ও নয়া ঔপনিবেশিক আধিপত্যের ত্রিচক্রাধীন নিয়ন্ত্রণ পরিমন্ডলকে স্থিতি দিয়েছে এবং কার্যত সংকীর্ণ রাজনীতিক স্বার্থের সহযোগে অসাংবিধানিক গ্যারিসন কন্সটিটুয়েন্সির প্রত্যক্ষ–পরোক্ষ শাসনকে বা এর ওপর নির্ভরতাকে বজায় রাখছে, সেই সত্য বেশ কিছু মূল ও প্রাথমিক ডকুমেন্টের ভিত্তিতে তুলে ধরা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে। রাষ্ট্র, রাজনীতি, সংবিধান, সরকার, প্রশাসন, শ্রেণী স্বার্থ, ধর্ম–ব্যবসা, আন্তর্জাতিক পুঁজির আধিপত্য, সামরিক বাহিনীর কর্পোরেট স্বার্থ, এসবের উল্টোধারায় জনগণের সংগ্রাম ইত্যাদি পরস্পর প্রবিষ্টতা ও পরস্পর নির্ভরতার বহুমাত্রিক বাস্তবতায় বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর ভিত্তিতে দেশে সাংবিধানিকতা ও গণতন্ত্রের প্রশ্ন বিচার–বিশ্লেষণ করে দেখাই আলোচ্য প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য নির্মাণ করেছে।*

১. ভূমিকা

১৯৯০–এর গণ অভ্যুত্থান ও এরশাদের পতন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন আর অতঃপর সংসদ ও সরকার গঠনের পর পূর্বের ন্যায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে সাংবিধানিকতা, জন অধিকার ও গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার কথা সর্বদা সরবে উচ্চারিত হচ্ছে। সরকার এবং বিরোধী পক্ষ উভয়েই সাংবিধানিকতা রক্ষার ওপর জোর দিচ্ছেন। উভয় পক্ষ, তাদের নেতা ও কর্মীরা এবং তাদের সংগঠনগুলো বক্তৃতা–বিবৃতিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংবিধানের পবিত্রতা ও মর্যাদা, সংবিধানের সংরক্ষণ, সকল কর্মকান্ডের সংবিধান–সম্মত ভিত্তি যাচাই এবং সর্বোপরি সাংবিধানিক সরকারের দাবী ইত্যাদি বক্তব্য তুলছেন। এসবই যেমন সংবিধানকে উচ্চে তুলে ধরার ঘোষিত কর্মকান্ড,

---

* সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তেমনি এর মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার, গণতন্ত্র চর্চার, জন অধিকার ও স্বাধীনতা বজায় রাখার এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার আপাত আকাঙ্ক্ষাও ব্যক্ত হচ্ছে।

বর্তমান আলোচনায় ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর প্রেক্ষাপটে সাংবিধানিকতা ও গণতন্ত্রের বিপর্যয় ও বিনাশ সাধন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হবে। লক্ষণীয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ২৬টি বা তারও বেশী সংশোধনী হলেও সেটার মূল চেতনা, অন্তঃসার ও ইতিবাচক কার্যক্ষমতা টিকে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশ সংবিধানে কেবল ১০টি সংশোধনী এলেই তা কেন মূল সংবিধানের চেতনা, অন্তঃসার ও ইতিবাচক কার্যক্ষমতাকে ধ্বসিয়ে দেয়? কিভাবে এসব সংশোধনী একটি গণতান্ত্রিক সংবিধানকে স্বেচ্ছাচারী সংবিধানে রূপান্তরিত করে? এ প্রশ্নের উত্তর বের করা দরকার। প্রয়োজন আজ এটা বোঝা যে, ৪৪ বছর ধরে একটানা সংগ্রাম করেও এদেশের মানুষ কেন অধিকার পায়নি, মুক্তি পায়নি? কেন আজও তাদেরকে আর্থনীতিক শোষণ ও রাজনীতিক স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাতে হয়? পাকিস্তানী অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক শোষণের নিগড় থেকে মুক্ত হবার পরও কেন আজ তাদের জীবন বিপর্যস্ত? কিভাবে বাংলাদেশে, এর আর্থ-সামাজিক জীবনে একই শ্রেণীর শোষণ এতগুলো বেসামরিক-সামরিক, নির্বাচিত ও বল প্রয়োগে ক্ষমতা দখলকারী সরকার অদল-বদলের পরও টিকে থাকে? কিভাবে স্বেচ্ছাচারী, দূরাচারী রাষ্ট্র ও রাজনীতি মানুষকে অক্টোপাসের মতো আটকে রাখে? কিভাবে মানুষ ব্যক্তিক ও গোত্রীয় স্বেচ্ছাচারের কাছে বন্দী? কিভাবে গত ১৫ বছর ধরে এদেশে সামরিক স্বেচ্ছাচার টিকে ছিলো? কেমন করে ১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থানের পরও স্বেচ্ছাচারী সামরিক-আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোটি বহাল তবিয়তে বজায় রাখে স্বীয় অস্তিত্ব? সর্বোপরি, কেন সাংবিধানিকতা, সাংবিধানিক সরকার ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এত ত্যাগ-তিতিক্ষার পরও জনমন্ডলীর জীবনে ধরা দেয় না? যেক্ষেত্রে নিকট ইতিহাস থেকেই আমরা দেখি যে, আর্থনীতিক শ্রেণী-শোষণমুক্তি ও বন্টনে সাম্য; গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও জন স্বাধীনতা; জাতীয় স্বকীয়তা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি নিয়ে বাঁচা; এবং ধর্মের রাজীতিক ব্যবহার বর্জিত ও শোষণ থেকে মুক্ত পরিবেশে সকল ধর্মের মানুষের সম অবস্থান ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন – এসব উদ্দেশ্য নিয়ে ২৪ বছর ধরে সংগ্রাম করে অবশেষে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে লব্ধ স্বাধীন বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার চার আদর্শকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে সংবিধানে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এদেশের মানবমন্ডলী।[২]

যাহোক, বাংলাদেশের ১৯৭২ সালে আদি সংবিধান এবং সংশোধনের প্রক্রিয়ায় এর বিপর্যয়ের ইতিহাস ও রাজনীতি বোঝার জন্যে বর্তমান প্রবন্ধে ১৯৭৩ সালে কৃত সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়াস মিলবে। সমগ্র আলোচনা এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্র-রাজনীতি এবং এসবের ভিত্তিমূলে যে সমাজ-সম্পর্ক তার পরিপ্রেক্ষিতে সংকটের স্বরূপ উপলব্ধির জন্যে মোটামুটিভাবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায়

সাংবিধানিকতা বলতে কি বোঝায় এবং সেক্ষেত্রে গণতন্ত্রের সাথে সাংবিধানিকতার যোগাযোগ কি ধরনের, প্রথমে সে সম্পর্কে খানিকটা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উপস্থিত করা হবে।

২. সাংবিধানিকতা ও গণতন্ত্র

কনস্টিটিউশনালিজম বা সংবিধানতন্ত্র বা সাংবিধানিকতা কোনো নির্দিষ্ট দেশে রাষ্ট্র পরিচালনাকারী মৌল বিধানমালা হিসেবে সে দেশের সংবিধানের সর্ব প্রাধান্য (সুপ্রীমেসি) ও কার্যকর উপস্থিতিকে নির্দেশ করে। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন হিসেবে সংবিধানের স্বীকৃতি এবং অন্যান্য সকল আইন ও কর্মকান্ডের উৎস হিসেবে সংবিধানের ক্রিয়াশীল অবস্থান ও বাস্তব মর্যাদাই সাংবিধানিকতার প্রত্যয়কে নির্মাণ করে। রাষ্ট্র জন নিয়ন্ত্রিত ও জনগণের কল্যাণের জন্যে অধিষ্ঠিত, সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ; এবং জনগণের ইচ্ছা ও সম্মতি, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণের ভেতর দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় – লোকায়ত রাজনীতিক সাবভৌমত্ব ও প্রকৃত গণতন্ত্রের এই দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্যের বাস্তব স্বীকৃতির ভেতর দিয়ে যে সংবিধান সৃজিত, গৃহীত ও কার্যকর, সেটাই সাংবিধানিকতার চেতনাকে ধরে রেখেছে। আর এই সংবিধানের প্রাধান্য নিয়ে যে রাষ্ট্র জীবন–চর্চা করছে, সেটাই সাংবিধানিকতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে বলতে হবে। সাংবিধানিকতা যেখানে কার্যকর, সেখানে লোকয়ত রাজনীতিক সার্বভৌমত্ব ও আইনগত সার্বভৌমত্বের বিরোধ সচরাচর দৃষ্টিগোচর নয়। এহেন সমাজে গণ সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র বাস্তব স্বীকৃতি অর্জন করে এবং সংবিধানের সর্ব প্রাধান্য সমগ্র সমাজ কর্তৃক মান্য হয়। সংবিধানের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে স্বাধীন বিচার–ব্যবস্থা ভূমিকা নেয় এবং সংবিধান–পরিপন্থী যে–কোনো কিছু বা বিধান বাতিল বলে গণ্য হয়। তবে সাংবিধানিকতার চেতনা বহনকারী সংবিধান ও রাষ্ট্রব্যবস্থা তাই বলে স্থানু নয়। এটা সচল এবং পরিবর্তনকে স্বীকৃতি দেয়। যুগোপযোগী সংশোধনী এহেন সংবিধানেও খুবই সম্ভব। কিন্তু তা সংবিধানকে প্রকৃত অর্থে মেনে নিয়েই, কেবল সংবিধান নির্দেশিত পথেই। এবং সেক্ষেত্রে সংবিধানের মৌল আদর্শ ও লক্ষ্য এবং চেতনাকে আঘাত করার অবকাশ নেই। প্রধানত লিখিত হলেও এর বিপরীতে মূল কিছু নিয়ম–নীতি, প্রথা, লোকাচার, ব্যাখ্যা নির্ভর অলিখিত সাংবিধানিক কাঠামোতেও সাংবিধানিকতা কার্যকর হতে পারে। তবে প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে, কাঁচি ও ছুরি চালিয়ে কোনো সংবিধানকে শেষ করে, ছিবড়ে করে ফেলার পর যা–তা একটা কিছুকে সংবিধান বলে তুলে ধরলেই তা প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংবিধান হবে না। এবং সে অবস্থায় সংবিধানের পবিত্রতা ও মর্যাদা, সংবিধানসম্মত কর্মকান্ড, সংবিধান সংরক্ষণ, সাংবিধানিকতা, সাংবিধানিক সরকার ও গণতন্ত্র চর্চা ইত্যাদির কথা বলা হবে নির্জলা প্রতারণা। অগণতান্ত্রিক ও স্বেচ্ছাচারী সংবিধান সাংবিধানিকতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, জন অধিকার দিতে সক্ষম হয় না, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে অবদান রাখে না।

অপরপক্ষে প্রকৃত সাংবিধানিকতা রাষ্ট্র অন্তর্গত মানবিক আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিক জীবন পরিচালনাকালে বস্তুত ক্রিয়াশীল হয় সীমিত সাংবিধানিক সরকারের (লিমিটেড কন্সটিটিউশনাল গভর্ণমেন্ট) মাধ্যমে। অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা, স্বেচ্ছাচার ও ব্যক্তি প্রাধান্য-কর্তৃত্বের বিপরীতে নিয়ন্ত্রিত, সীমাবদ্ধ, গণতান্ত্রিক ও গণ-নির্ভর এবং আইন দ্বারা শাসিত সরকারকেই সাংবিধানিক সরকার বলা হয়। জনগণের ইচ্ছা ও সম্মতি এবং সার্বভৌম ক্ষমতা যে সংবিধানে প্রতিফলিত, সেটার মৌল চেতনা, নিয়ম-নীতি-নির্দেশ এবং তদ্-অন্তর্গত আইনের কাঠামোর ভেতর সাংবিধানিক সরকার কাজ করে। জনগণের কল্যাণ এবং ঐক্যমত্য-নির্ভর সংবিধান নির্দেশিত রাষ্ট্রাদর্শকে ভিত্তি করে জনগণের সম্মতি সাপেক্ষে ব্যক্তির অধিকার ও জন স্বাধীনতা রক্ষাপূর্বক আইনের আনুগত্য ও সীমার মধ্যে থেকে যে সরকার নিজেকে পরিচালিত করে, সেটাই সাংবিধানিক সরকার। এজন্যে স্বেচ্ছাচারীভাবে, ব্যক্তি-গোত্র বা শ্রেণীর সংকীর্ণ স্বার্থে বলপ্রয়োগে বা কূট কৌশলে যখন ব্যক্তি, গোত্র বা চক্র কোনো সংবিধান প্রদান করে কিংবা কোনো সংবিধানকে নিয়ন্ত্রণ, সংশোধন বা অদল-বদল করে রাষ্ট্র পরিচালনা করে, তখন তার বা তাদের কর্মকান্ড সাংবিধানিতাকে অনুসরণ করে না। এমতাবস্থায় তার বা তাদের সরকারকে সাংবিধানিক সরকারও বলা যায় না। কেননা সংবিধানের সর্ব প্রাধান্য, প্রকৃত লোকায়ত সার্বভৌমত্ব, জনগণের মৌলিক অধিকার, জনমত-গণ ইচ্ছা ও সম্মতি, প্রকৃত গণঅংশগ্রহণভিত্তিক গণতন্ত্র, সংবিধান-নির্দেশিত ঐকমত্য নির্ভর মৌল রাষ্ট্রাদর্শ ও আইনের কাঠামোয় ক্রিয়াশীলতা - ইত্যাদি সব কিছুকে অস্বীকার করে ওই ধরনের সরকার ব্যবস্থা। এ কারণে ওই ধরনের সরকার প্রকৃত অর্থে বৈধ হতে পারে না।

সাংবিধানিক সরকার জনমত ও গণতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল। এর কর্মকান্ড সর্বপ্রাধান্য বিস্তারকারী মৌল আইন তথা সংবিধানের নীতি-নির্দেশ ও বিধি-ব্যবস্থার কাঠামোয় পরিচালিত। মৌলিক অধিকার ও জন স্বাধীনতার স্বীকৃতি ও কার্যকর নিশ্চয়তা, শাসন পদ্ধতির সুনির্দিষ্টতা, সরকারী ক্ষমতার সংবিধানভিত্তিক ও আইনানুগ সীমাবদ্ধতা, ক্ষমতার বন্টন ও বিকেন্দ্রীকরণ, আইনের চোখে সাম্য, রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনায় গণ অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব, দায়িত্বশীলতা ও প্রকাশ্য কার্য-পদ্ধতি এবং সর্ব পর্যায়ে সার্বক্ষণিকভাবে গণতন্ত্র চর্চার মাধ্যমে শাসন পদ্ধতির স্থিতিশীলতা-ভারসাম্য-গতিশীলতা - এসবই সাংবিধানিক সরকারের চরিত্রে ও কর্মকান্ডে অনিবার্যভাবে সমুপস্থিত। সংবিধান নির্দেশিত ও আইনানুগ পথে পরিচালিত বলে সাংবিধানিক সরকার জন সম্পৃক্ত এবং জন-চোখে বৈধ প্রতিপন্ন। ক্ষমতার নিয়মভিত্তিক পালাবদল, শাসন ব্যবস্থা এবং সংবিধানের নিরবচ্ছিন্ন ও ভাঙ্গনবিহীন কার্যকারিতা রক্ষার ক্ষেত্রে এ কারণেই সাংবিধানিক সরকার সর্বাধিক পারদর্শী। এজন্যে সাংবিধানিক সরকারকে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নয়, আইনের সরকার বলা হয়। এখানে জনগণের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রের স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা সংবিধান নির্দেশিত পথে সংবিধান সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। এতে করে শাসন কাঠামো স্বেচ্ছাচারী হবার সুযোগ পায় না। সাংবিধানিকতা এভাবেই সাংবিধানিক সরকারের ভেতর দিয়ে ক্রিয়াশীল হয়। এটা সংবিধানের সর্ব

প্রাধান্য এবং জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতাসহ প্রকৃত গণতন্ত্র চর্চার পরিবেশ সৃজন ও সংহত করে। বস্তুত সাংবিধানিকতার স্মারক যে সাংবিধানিক সরকার, সেটাই প্রকৃত অর্থে নিজেকে গণতান্ত্রিক সরকার বলে দাবী করতে পারে। সাংবিধানিকতা ও গণতন্ত্র তাই একটি মুদ্রার দু'টি পিঠ।

তাত্ত্বিক এ আলোচনার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী এবং এর পেছনকার রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এ থেকে দেখা যাবে যে, কিভাবে এই সংশোধনী বাংলাদেশে সংবিধান, সাংবিধানিকতা, সাংবিধানিক সরকার, মৌলিক অধিকার ও জন স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র ধ্বংস করার কাজে লেগেছে এবং কিভাবে, কোন প্রক্রিয়ায়, কোন্ স্বার্থে পরবর্তী সংশোধনীগুলো সম্ভব হয়েছে।

৩. মৌলিক অধিকার ও জন স্বাধীনতা নস্যাৎকরণ

১৯৭৩ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর উত্থাপনের পর ২২শে সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে ১৯৭২ সালের সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী গ্রহণ করে ওই সংবিধানের ২৬, ৩৩, ৬৩, ৭২ এবং ১৪২ অনুচ্ছেদ বা ধারাকে সংশোধন করা হয়। এছাড়া সংবিধানের নবম ভাগের সাথে নবম-ক ভাগ (পার্ট নাইন-এ) নামে একটি অংশ সংযোজিত হয়। এটি ১৯৭৩ সালের ২৪ নং এ্যাক্ট নামেও পরিচিত।[৩]

সংবিধানের ২৬ ধারার (২) উপ ধারার পর একটা নয়া (৩) উপধারা সংযোজন করা হয়। উপধারাতে বলা হয়, সংবিধানের ১৪২ ধারার অধীনে প্রণীত সংশোধনের ক্ষেত্রে এই ধারার কোনো কিছুই প্রযোজ্য হবে না। মূল সংবিধানের ২৬ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী দেখা যায় যে, রাষ্ট্র সংবিধানের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের সাথে সাযুজ্যহীন কোনো আইন প্রণয়ন করবে না এবং সেরকম কোনো আইন প্রণীত হলে সেটা পুরোপুরি বা তার অসমঞ্জস অংশ বাতিল হয়ে যাবে। এভাবে ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকারকে সর্বোচ্চ প্রাধান্যসহ স্বীকৃতি দিয়ে সংবিধানের ভিত্তিমূল বলে গ্রহণ করা হয়। এতে করে দেশে জন অধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে গণতন্ত্র গড়ে তোলার সুযোগ তৈরী হয়। কাজেই এর বিপরীতে দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে ২৬ ধারার সাথে (৩) উপধারা সংযোজনের ভেতর দিয়ে তৎকালীন সরকারের উদ্দেশ্য ছিল ১৪২ ধারা কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে প্রণীত কোনো সংশোধন আইনের ব্যাপারে (২) উপধারা যাতে প্রযোজ্য না হয়, তার ব্যবস্থা করা। এর ফলে ১৪২ ধারানুযায়ী দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের পদ্ধতি গ্রহণ করে নিজেদের ইচ্ছামতো সংসদের মাধ্যমে যে-কোনো সংশোধন আইন পাশের সুযোগ করে নিলো তৎকালীন সরকার। মূল সংবিধান অনুযায়ী সাধারণ বিধান সভা হিসেবে জাতীয় সংসদ সাধারণ পদ্ধতির মাধ্যমে এমন কোনো আইন তৈরী করার অধিকারী নয়, যা জনগণের মৌলিক

অধিকার সংক্রান্ত কোনো ধারার বিরুদ্ধে যায়। অথচ উল্লিখিত সংশোধনীর মাধ্যমে সরকার সে ব্যবস্থা করে নেয়। তখন থেকে যে-কোনো সংশোধনী গ্রহণের সুযোগ এলো এবং তাতে করে মৌলিক অধিকারে আঘাত এলেও বা সেসব হরণ বা বিনষ্ট করা হলেও কোর্টে যাওয়া বা বিচারের আশ্রয় নেয়ার অবকাশ রইলো না।

এদিকে সংবিধানের মূল ১৪২ ধারাকে সেটার (১) উপধারা হিসেবে কিছু শব্দগত বদল সহ গ্রহণ করে তার সাথে একটা (২) উপধারা সংযোজন করা হয়। (২) উপধারায় বলা হয়, এই ধারার অধীনে প্রণীত কোনো সংশোধনের ক্ষেত্রে ২৬ ধারার কোনো কিছুই প্রযোজ্য হবে না। এর ফলে ১৪২ ধারা অনুযায়ী কোনো সংশোধনীকেই ২৬ ধারানুযায়ী অবৈধ-বলা এবং বাতিল করা সম্ভব হবে না। এভাবে সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী অনুযায়ী ২৬ ধারা ও ১৪২ ধারা – এ উভয়কে একই উদ্দেশ্যে সংশোধন করে তৎকালীন সরকার জাতীয় সংসদকে সংবিধান সংশোধনের চূড়ান্ত এখতিয়ার দিয়ে দেয়। ২৬ আর ১৪২ ধারায় এই সংশোধনীর ফলে জাতীয় সংসদ কর্তৃক যে-কোনো ধরনের সংশোধনী আইন গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে মৌলিক অধিকার বিপর্যস্ত বা হরণ করা হলেও কোর্ট মৌলিক অধিকার রক্ষার্থে ওই সংশোধনী আইনকে উথাপিত কোনো অভিযোগের ভিত্তিতে অবৈধ ও সেকারণে বাতিল বলে ঘোষণা করতে পারবে না।

১৯৭৩ সালে এই দ্বিতীয় সংশোধনী করার কিছুদিন পরই ১৯৭৪ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার কালাকানুন বলে পরিচিত *'স্পেশাল পাওয়ার এ্যাক্ট'* বা বিশেষ ক্ষমতা আইন এবং জরুরী অবস্থা জারী করে জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করে, জন স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার ছিনিয়ে নেয়। এছাড়া *'প্রিন্টিং এ্যান্ড পাবলিকেশনস্ অর্ডিন্যান্স'* দ্বারাও সংবাদপত্র ও মত প্রকাশের অধিকার বিনষ্ট করে। অতঃপর ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী শেখ মুজিব নেতৃত্বাধীন তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী চাপিয়ে দিয়ে সাংবিধানিকতা, জন অধিকার ও বহু দলীয় গণতন্ত্রের প্রক্রিয়া বানচাল করে। ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে (রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি) ১১ নং ধারায় "গণতন্ত্র ও মানবাধিকার" সম্পর্কে বলা হয়েছিলঃ "প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে"।[৪] চতুর্থ সংশোধনী (১৯৭৫ সালের ২নং আইন) অনুযায়ী আওয়ামী লীগ সরকার তৎকালীন সংসদকে দিয়ে "এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে"–এই বাস্তবে গণতন্ত্র চর্চার ও রাষ্ট্রের ওপর জন নিয়ন্ত্রণের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকু বিলুপ্ত করে দেয়। এমতাবস্থায় বাংলাদেশে গণতন্ত্র, মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা অস্তিত্ববিহীন হয়ে পড়ে।

আবার ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী চতুর্থ সংশোধনী চাপিয়ে দিয়ে বস্তুত আওয়ামী লীগ সরকার মূল সংবিধানে ৩৮ এবং ৩৭ নং ধারায় প্রদত্ত জনগণের রাজনৈতিক সংগঠন ও সমাবেশ করার স্বাধীনতা নস্যাৎ করে। এটা করা হয় সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে দিয়ে কেবল একদলীয় *'বাকশাল'* গঠন করে এবং অন্য কোনো দলের অনুকূলে সমাবেশের সুযোগ বন্ধ করে দিয়ে। মূল সংবিধানের ৩৯ নং ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হয় কার্যত সকল পত্র-পত্রিকা বন্ধ করে দিয়ে কেবল সরকার নিয়ন্ত্রিত চারটি পত্রিকা রেখে। এছাড়া *'বাকশালের'* বাইরে বা বিপরীতে কোনো প্রকার মত প্রকাশের অবকাশকে ধ্বংস করা হয়। বিচার বিভাগকে প্রশাসনের কব্জায় আনা হয় এবং এর অধিকার খর্ব করা হয়। এভাবে মৌলিক অধিকার, জন স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র ধ্বংস হয়, সাংবিধানিকতা প্রহসনে রূপান্তরিত হয়।

এদিকে ১৯৭৫ সালের ১৫ই অগাস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে আজ অবধি মুশতাক, সায়েম, জিয়া, সাত্তার, এরশাদ এবং এখনকার খালেদার বিএনপি সরকার তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারকে গণতন্ত্র ধ্বংস করার অভিযোগে কঠোরভাবে অভিযুক্ত করলেও তারা কেউই ১৯৭৩ সালের সংশোধনী, ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন এবং জন অধিকার নস্যাৎ করে সংসদের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা লাভের বিষয়টিকে বাতিল করেনি। ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারীর চতুর্থ সংশোধনী ও সেই সঙ্গে গৃহীত ব্যবস্থাকে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ সরকার *"দ্বিতীয় বিপ্লব"* ও *"শোষিতের গণতন্ত্র"* বলে আখ্যায়িত করলেও সেটি ছিল বাস্তবে নিষ্ঠুরতম পদ্ধতিতে গণতন্ত্র নিধনযজ্ঞ। তবে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক ১৯৭৫ সালে সংবিধান থেকে বাতিলকৃত "এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে" – এই মূল নীতিটিকে কিন্তু আর কোনো সরকারই পুনর্বহাল করেনি, যদিও ১৯৭৫ এর পরবর্তী সরকার *'বহুদলীয়'* ও *'বাংলাদেশী'* গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা বারবার দিয়েছিল। আবার চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের নামে প্রতিষ্ঠিত এক ব্যক্তিক স্বেচ্ছাচারকেও বাতিল করা হয়নি। তারা একের পর এক সামরিক ঘোষণা, অধ্যাদেশ ও ফরমান দ্বারা ব্যক্তিক স্বেচ্ছাচারের মাত্রা বাড়িয়েছে এবং সংবিধানের পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনীর মাধ্যমে সেগুলোকে জায়েজ করেছে।[৫] বর্তমানে খালেদা জিয়ার সরকারও পূর্ববর্তী স্বেচ্ছাচারী পরিবর্তনসমূহ মেনে নিয়েই প্রশাসন চালাচ্ছে। ১৯৭৩ সালের দ্বিতীয় সংশোধনী এবং তাতে ২৬ এবং ১৪২ ধারায় স্বেচ্ছাচারী বদল আনার ফলেই মূলত তৈরী হয় সংবিধান, সরকার ও রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী হবার পথ।

আবার ১৯৭৬ সাল থেকে জিয়া সরকার কর্তৃক সামরিক আইন রেখে মৌলিক অধিকার স্থগিতকরণ, গোড়াতে রাজনীতি ও রাজনীতিক দল নিষিদ্ধ করণ, পরবর্তীকালে পি. পি. আর দিয়ে লাইসেন্সের রাজনীতি, ঘরোয়া রাজনীতি, সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার

স্থলে বিশেষ ধর্মের একাধিপত্য ও সাম্প্রদায়িক ভাবধারা প্রতিষ্ঠা, সাম্প্রদায়িক চেতনাপুষ্ট ও স্বাধীনতা বিরোধীদের পুনর্বাসন ও সাম্প্রদায়িক দল গঠনের অধিকার দান, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব প্রদান ও সংবিধানের অন্যান্য মূল নীতির পরিবর্তন ইত্যাদি সবকিছুই সম্ভব হয়েছে ফরমান ও অধ্যাদেশের দ্বারা এবং গোড়াতে এসব কার্যকর হয়ে অতঃপর পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কেবল ১৯৭৩ সালের দ্বিতীয় সংশোধনী অনুযায়ী মূল সংবিধানের ২৬ এবং ১৪২ ধারায় ইচ্ছামতো সংবিধান বদলে ফেলার স্বেচ্ছাচারী বিধি সন্নিবেশিত থাকায়। একই কারণে ১৯৮৮ সালের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে গণতন্ত্র বিমুখ স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারও পেরেছে রাষ্ট্র-ধর্ম চাপিয়ে দিতে।

এখন যদি ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের ২৬ ধারায় বর্ণিত বিধান অনুযায়ী মৌলিক অধিকারসমূহের সঙ্গে অসমঞ্জস যে-কোনো আইন বাতিল হওয়া এবং রাষ্ট্রকে তেমন আইন প্রণয়ন থেকে বিরত রাখার গৃহীত ব্যবস্থা বহাল থাকতো এবং দ্বিতীয় সংশোধনী অনুযায়ী এগুলো বাতিল না করা হতো ও সংসদকে যে-কোনো আইন করার বা সংশোধন-সংযোজনের স্বেচ্ছাচারী অধিকার না দেয়া হতো, তাহলে ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ২৬ থেকে ৪৭ ধারায় বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহের বিধানানুযায়ী পি. পি. আর. ও লাইসেন্সের রাজনীতি, সংবিধানে ধর্মীয় রাজনীতিকে স্বীকৃতি দান ও রাষ্ট্রধর্মের নামে লোক ঠকানো, সাম্প্রদায়িক রাজনীতিক দল গঠন, স্বাধীনতা বিরোধীদের পুনর্বাসন, রাষ্ট্রীয় অন্যান্য মূল নীতিগুলিতে গণতান্ত্রিক আদর্শ-বিরোধী পরিবর্তনসমূহ সাধন সহজ হতো না, সম্ভবও হতো না। কেননা মূল সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ তো বটেই, সেই সঙ্গে কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান, ধর্মের কারণে কোনো বৈষম্য প্রদর্শন, ধর্মীয় রাজনীতি ও ধর্মীয় দল গঠন ইত্যাদি একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। এসবের জন্যে এদেশের মানুষের ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনাকেও সাম্প্রদায়িক খাতে প্রবাহিত করা সম্ভব ছিল না।

তাই ১৯৭৩ সালের দ্বিতীয় সংশোধনী মারফৎ ২৬ এবং ১৪২ ধারায় স্বেচ্ছাচারী পরিবর্তন এনে গোড়াতে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারই গণতন্ত্র ধ্বংস করে এবং পরবর্তীকালে দু'টো অসাংবিধানিক সামরিক শাসনের যাবতীয় ফরমান, ঘোষণা, সামরিক আইনের বিধান এবং পঞ্চম, সপ্তম ও অষ্টম সংশোধনী জারীর সুযোগ করে দেয়। তদুপরি সামরিক জান্তার শাসন বিরোধী বক্তব্য প্রদান সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ ১৯৭৯ এবং ১৯৮৬ - এই দু'বারই সামরিক আইনের আওতায় দু'জন জেনারেলের অগণতান্ত্রিক অসাংবিধানিক শাসনামলে যথাক্রমে পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনী পাশের ক্ষেত্রে সহায়তা দেয় নির্বাচনে অংশ নিয়ে এবং সংসদ গঠনের ব্যবস্থা করে দিয়ে।[৬]

৪. নিবর্তনমূলক আটকাদেশ ও গণতন্ত্রহীনতা

এবার দ্বিতীয় সংশোধনী সম্পর্কিত আলোচনার অন্যান্য বিষয়ে যাওয়া যেতে পারে। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে জাতীয় সংসদে গৃহীত দ্বিতীয় সংশোধনী অনুযায়ী সংবিধানের মূল ৩৩ ধারার চূড়ান্ত বদল ঘটিয়ে এর যথার্থ গণতান্ত্রিক চেতনাকে নস্যাৎ করা হয়। মূল ৩৩ ধারা অনুযায়ী গ্রেফতারকৃত কোনো ব্যক্তিকে যথা শীগগীর গ্রেফতারের কারণ না জানিয়ে আটক রাখা চলবে না। এ ছাড়া ওই ব্যক্তিকে তার মনোনীত আইনজীবীর দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে আটকের স্থান থেকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে নেয়ার জন্যে দরকারী সময়টুকু ছাড়া গ্রেফতারের ১ দিন অর্থাৎ ২৪ ঘন্টার ভেতর নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করতে হবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়া তাকে ২৪ ঘন্টার অধিক আটকে রাখ চলবে না। ৩৩ ধারা অনুযায়ী শুধু বিদেশী শত্রুরাই উল্লিখিত অধিকার-রক্ষা কবচগুলোর বাইরে ছিল। কিন্তু ৩৩ ধারার সংশোধনীতে বিদেশী শত্রুসহ বাংলাদেশের যে-কোনো নাগরিককে গ্রেফতার করে ২৪ ঘন্টার বেশী ধরে আটক রাখার বন্দোবস্ত হয়ে গেল। অধিকার-রক্ষা কবচগুলো দেশের নাগরিকদের জন্যেও আর প্রযোজ্য হবে না। এভাবে জাতীয় সংসদকে নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়া হয় এবং জনগণের অধিকার খর্ব করার সুযোগ তৈরী হয়। ওই সংশোধনীর মাধ্যমে কোনো আইনের অধীনে ছয় মাসের বেশী বিনা বিচারে আটক রাখা যেত না। অবশ্য ৩৩ ধারার (৪) উপধারা অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের বিচারক অথবা বিচারক হবার যোগ্য দু'জন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত একজন প্রবীণ কর্মচারীকে নিয়ে মোট তিন সদস্যের একটা উপদেষ্টা কাউন্সিল ছয় মাস শেষ হবার আগে কোনো গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির বক্তব্য শুনে যদি মনে করেন যে তাকে ছয় মাসের বেশী আটক রাখার যথেষ্ট কারণ রয়েছে তাহলে ওই ব্যক্তিকে সেভাবে আটক রাখা যাবে। কোনো ব্যক্তিকে নিবর্তনমূলক আটক আইনের অধীনে গ্রেফতার করা হলে ওই আটকাদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ তাকে যথা শীগগীর গ্রেফতারের কারণ জানাবেন এবং ওই নির্দেশের ব্যাপারে তার বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ দেবেন যথা শীগগীর সম্ভব। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ''জনস্বার্থ বিরোধী'' হয়ে যাবে মনে করলে এ ব্যাপারে কোনো তথ্য প্রকাশ থেকে বিরত থাকতে পারবেন।

নিবর্তনমূলক আটকাদেশ মৌলিক মানবাধিকারের বিরোধী, ব্যক্তি ও জন স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের পরিপন্থী। এহেন ক্ষমতা শাসককে পক্ষপাতদুষ্ট, প্রতিহিংসাপরায়ণ ও স্বৈরাচারী করে তোলে। এর ফলে রাষ্ট্র হয়ে পড়ে স্বেচ্ছাচারী ও গণবিরোধী। সাংবিধানিক মৌল প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জন অধিকার রক্ষা করে গণতন্ত্র চালু করা এমতাবস্থায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তৎকালীন ঔপনিবেশিক পাকিস্তানের ১৯৫৬ এবং ১৯৬২ সালের সংবিধান দু'টিতে এই নিবর্তমূলক আটকাদেশের বিধান ছিল এবং বর্তমান ভারতীয় সংবিধানেও এটা আছে। তবে প্রকৃত কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বাভাবিক

অবস্থায় তো নয়ই, এমনকি বহিরাক্রমণ বা যুদ্ধ কালেও অত্যন্ত বিশেষ ক্ষেত্রে কেবল আইনসভার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে কাউকে আটক রাখা যায় স্বল্পতম সময়ের জন্যে।

পাকিস্তানী শাসনামলে নিবর্তনমূলক আটকাদেশের শিকার হয়েছিল এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা। ওই আটকাদেশ ছিল পাকিস্তানের উভয় দশকে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচার বজায় রাখার ও শোষণ স্থায়ী করার হাতিয়ার। আর তা প্রযুক্ত হয়েছিল বাংলাদেশের প্রতিবাদী চেতনার বিরুদ্ধে। এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণ ও নেতা-কর্মীরা অত্যন্ত সোচ্চার ছিল এবং তারা লড়াইও করেছে একটানা। সেই তিক্ত ও ভয়াবহ অভিজ্ঞতা থেকেই মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে স্বাধীনতা লাভকারী নতুন বাংলাদেশে রাজনীতিক অবস্থার চাপ ও ব্যাপক গণ দাবীর মুখে ১৯৭২ সালের সবিধানে গণতন্ত্রের মূল নীতি যেমন গৃহীত হয়েছিল এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ-আয়োজন করা হয়েছিল, তেমনি একই সাথে এ মহৎ লক্ষ্যের অনুকূলে জন অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে মূল সংবিধানে নিবর্তনমূলক গ্রেফতার ও আটক রাখা সম্পর্কিত কোনো আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদকে দেয়া হয়নি। সংবিধানের প্রণেতারা সেই সময় গণতান্ত্রিক বোধের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং পর্যবেক্ষক মহলও মনে করেছিলেন যে, বাংলাদেশ সংবিধানে অতীত অবস্থা থেকে বিপরীতে গিয়ে নির্বতনমূলক আটকাদেশ সম্পর্কিত কোনো বিধান অন্তর্ভুক্ত না-হওয়াটা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও জনমুক্তি অর্জনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৫৭ সালে পাকিস্তান-অন্তর্ভুক্ত তৎকালীন পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সুস্পষ্ট বিরোধিতার মুখেও নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার করে বহু রাজবন্দীকে মুক্ত করেছিল।

অথচ স্বাধীন বাংলাদেশে কিছুদিন যেতে না যেতেই সব আশা ধূলিস্মাৎ হল। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে চাপানো দ্বিতীয় সংশোধনী মারফৎ সংবিধানের ৩৩ ধারায় বদল এনে নিবর্তনমূলক আটকাদেশ সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের অধিকার সংসদকে দেয়া হল। এতে করে কেবল যুদ্ধকালে নয়, শান্তিকালে ও স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও কোনো প্রমাণ ছাড়াই কিংবা কোনো অপরাধ সংগঠন ও সংঘটনের পূর্বেই সরকার বা আটককারী কর্তৃপক্ষ যে কাউকে দীর্ঘদিন বিনা বিচারে আটক রাখার আইন তৈরীর সুযোগ পেল। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, কিছুদিন পরই বাংলাদেশ সরকার নিবর্তনমূলক আইনগুলো করে জনগণের মৌলিক অধিকারকে নস্যাৎ করার প্রয়াস পায় এবং এ প্রক্রিয়া আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর সেটার সমালোচনাকারী প্রতিটি সামরিক ও বেসামরিকীকৃত সরকারগুলো চালু রাখে। তাদের আমলেও ওই নিবর্তনমূলক আইনসমূহের পূর্ণ মাত্রায় 'সদ্ব্যবহার' চলতে থাকে। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন জাতীয় সংসদকে দিয়ে '*বিশেষ ক্ষমতা আইন*' নামে অত্যন্ত নিকৃষ্ট একটা নিবর্তনমূলক আইন জারী করে। এটা তারা করতে সক্ষম হয় ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৩৩ নম্বর ধারার সংশোধনীর মাধ্যমে প্রাপ্ত ক্ষমতা বলে। সে সময় আওয়ামী

লীগ সরকারের রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এ ব্যাপারে আপত্তি করে রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করেন।

তৎকালীন পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ৭ ধারাটি প্রায় হুবহু অনুকরণ করে বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৩ ধারাকে সংশোধন করা হয় ১৯৭৩ সালে। উল্লিখিত সংশোধনীর ফলে অল্প দিনের ভেতরই নানা নিবর্তনমূলক আইন ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। জনগণের অধিকার নস্যাৎ করা, ব্যক্তির স্বাধীনতা বানচাল করা সহ গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিতে ও স্বেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠা করতেই এ সংশোধনী ভিত্তিতে থেকে কাজ করে। ১৯৭৩ থেকে ১৯৯০ সালের দৈশিক রাজনীতির খতিয়ান এবং গণতন্ত্রের নিধনযজ্ঞ থেকে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, গণতন্ত্র নস্যাৎ করা এবং গোষ্ঠী ও ব্যক্তির স্বার্থে স্বেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে খুব বিরাট 'অবদান' রেখেছে ওই সংশোধনীটি – নিজ আওতায় নিবর্তনমূলক আটক আইন তৈরী ও প্রয়োগের সুযোগ রেখে এবং সেগুলোর রাজনীতিক ব্যবহারের বাস্তব সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। অথচ পাকিস্তানী অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক শোষণ–শাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের ২৪ বছরের সংগ্রামের ভিত্তিই ছিল গণতন্ত্র, জন ও ব্যক্তির স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা এবং এই লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের সংবিধানে গণতন্ত্র গৃহীত হয়েছিল অন্যতম সাংবিধানিক মূলনীতি হিসেবে। এছাড়া জন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার এবং মৌলিক অধিকারের রক্ষাকবচও সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়েছিল।

অনুরূপভাবে দ্বিতীয় সংশোধনী দ্বারা মূল সংবিধানের ৬৩ ধারার (২) ও (৩) উপধারাদ্বয় বিলুপ্ত করে, অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে – এ অজুহাতে সংসদ আহবান না করেও জন নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও রাষ্ট্রকে রক্ষার নামে যে কোনো আইন জারী করার সুযোগ দেয়া হয় রাষ্ট্রপতিকে এবং সে আইনকে সংবিধানের কোনো ধারা বলেই অবৈধ ঘোষণা করা যাবে না! কিন্তু মূল সংবিধানে কোনো জরুরী অবস্থায় উল্লিখিত রকমের আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হলে এবং সে সময় সংসদ বৈঠকে না থাকলে সেটা আহবান করতে হতো। অর্থাৎ এভাবে মূল সংবিধান অনুযায়ী জনগণের প্রতিনিধিদের মতামত নিতে হতো এবং পরোক্ষে জনমত যাচাই করা হতো। গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক শাসনের এই রক্ষাকবচ দ্বিতীয় সংশোধনী দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

একইভাবে ১৯৭২ সালের আদি সংবিধানের ৭২ ধারার (১) উপধারানুযায়ী যেখানে সংসদের একটি অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের ভেতর ৬০ দিনের বেশী বিরতি থাকার সুযোগ ছিল না, সেখানে দ্বিতীয় সংশোধনী মারফৎ এটাকে করা হয় ১২০ দিন। এভাবে সংবিধানের ৬৩ ধারার (২) ও (৩) উপধারা এবং ৭২ ধারার (১) উপধারা সংশোধন করে সংসদ তথা জনপ্রতিনিধিদের পাশ কাটিয়ে, সংসদের অধিবেশন কম করে শাসকগোষ্ঠী সংকীর্ণ ইচ্ছানুযায়ী বিধি–বিধান জারী ও কর্মপন্থা গ্রহণের সুযোগ করে নেয়। শুধু আওয়ামী লীগ আমলেই নয়, সেই ১৯৭৩ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত প্রতিটি সরকার জনমত ও গণপ্রতিনিধিদের তোয়াক্কা না রেখে সংসদকে

"রাবার স্ট্যাম্প"–এ পরিণত করে ওই সংশোধনী বলে স্বেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠার সুযোগ পায়। এদিকে সামরিক সরকারদ্বয় তো একের পর এক তাদের বন্দুকের জোরে চাপিয়ে দেয়া শাসন ও অবৈধ কর্মকান্ডকে সামরিক ফরমান দ্বারা বলবৎ করে সংবিধানে এবং পরবর্তীকালে সংশোধনী বিল পাশ করিয়ে নিয়ে জায়েজ করে নেয় সাক্ষী গোপাল পার্লামেন্টে। গণতন্ত্র এভাবেই সুদূর পরাহত হয়ে পড়ে, জন অধিকার ও স্বাধীনতা লাঞ্ছিত হয় এবং সাংবিধানিক সরকারের সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়।

৫. জরুরী অবস্থার বিধান, স্বেচ্ছাচার ও গণতন্ত্রহীনতা

বাংলাদেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার গণ দাবীর প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতার পরপর রচিত ১৯৭২ সালের সংবিধানে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক আমলের জন স্বাধীনতা নস্যাৎকরণ, দুর্দশা চেপে বসা ও গণতন্ত্র বানচাল হবার তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে বিপরীতে গিয়ে জরুরী অবস্থা ঘোষণা সম্পর্কিত কোনো স্বতন্ত্র বিধান সংবিধানে রাখা হয়নি।

কিন্তু ১৯৭৩ সালের দ্বিতীয় সংশোধনী অনুযায়ী ওই ঔপনিবেশিক পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর আদর্শ অনুসরণ করে ১৯৫৬ এবং ১৯৬২ সালের স্বেচ্ছাচারী গণবিরোধী সংবিধানের অনুরূপ জরুরী অবস্থা জারী সংক্রান্ত বিধি–বিধান বাংলাদেশ সংবিধানের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এ সম্পর্কে সে সময় আওয়ামী লীগ সরকারের আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর ১৯৭৩ এর ২০শে সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন যে, "আপৎকালীন অবস্থা মোকাবিলায় প্রত্যেকটি সংবিধানেই জরুরী অবস্থা ঘোষণার ব্যবস্থা রয়েছে। আমাদের সংবিধানে এ ব্যাপারে একটা শূন্যতা ছিল। এই সংশোধনীর মাধ্যমে সেই শূন্যতা পূরণ করা হচ্ছে।"[৭] মন্ত্রী চুরি, ডাকাতি, চোরা কারবার দমনের জন্যে জরুরী অবস্থা জারীর প্রয়োজন হতে পারে বলে উল্লেখ করেন। এছাড়া ওই সময় আওয়ামী লীগ সরকারের মনে স্বাধীনতা বিরোধীদের অশুভ তৎপরতার বিষয়টিও ঠাঁই পেয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৭১–এর যুদ্ধাপরাধী বন্দী, গণ হত্যার সহযোগী, পাকিস্তান সরকারের দুষ্কর্মের সহায়তাকারী, রাজাকার–আল বদর, আল–শামস – এদের বিচার ও শাস্তি বিধানের জন্যে এবং স্বাধীনতা বিরোধীদের মোকাবেলার জন্যে ১৯৭৩ সালের ১২ জুলাই জাতীয় সংসদে উত্থাপন করে সরকার ১৪ জুলাই সংবিধান (প্রথম সংশোধনী) আইন (১৯৭৩ সালের ১৫ নং আইন) পাশ করে।[৮] কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার ৯৩০০০ বন্দী পাকিস্তানী সৈন্য (পি· ও· ডব্লিউ·) এবং চিহ্নিত ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী সামরিক কর্মচারী ও অন্যান্য সামরিক–বেসামরিক–প্রশাসনিক ক্ষেত্রের অভিযুক্তদের বিচারের ব্যবস্থা করেনি। এরা নির্বিঘ্নে ছাড়া পেয়ে যায়। তাছাড়া, দেশের ভেতরে থেকে যাওয়া গণহত্যাকারী, যুদ্ধাপরাধী ও পাকিস্তানী বাহিনীর দালাল–সহযোগী এবং রাজাকার, আলবদর, আল শামস ও শান্তি কমিটির লোকজনকে শেষাবধি বিচার না করে ও শাস্তি না দিয়ে শেখ মুজিব সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে

মাফ করেন। এটা ছিল অভাবিতপূর্ব, পৃথিবীর কোনো দেশে কখনও এরকমটি ঘটেনি। নাৎসী যুদ্ধাপরাধীদের আজও খুঁজে বের করে বিচার করা হচ্ছে, শাস্তি দেয়া হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকার উল্লিখিতদের ক্ষমা করে দিল ঠিকই, অথচ গণতন্ত্র, জন অধিকার ও জন স্বাধীনতার জন্যে ২৪ বছরের একটানা লড়াই ও সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের পর স্বাধীন বাংলাদেশে গণতন্ত্র কায়েমের স্বপ্নকে আঘাত করে ১৯৭৩ সালে পাশ করলো সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী।

সংবিধানের এই দ্বিতীয় সংশোধনী আইনের ভেতরে জরুরী অবস্থা জারী এবং এতদসংক্রান্ত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্যে সরকারকে খুবই উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা দিয়ে সংবিধানের '৯-এর ক ভাগ' (পার্ট নাইন-এ) নামে একটা অধ্যায় সংযোজন করা হয়। এর ভেতরে থাকে ১৪১ক, ১৪১খ এবং ১৪১গ ধারা। ১৯৭৩ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী চতুর্থ সংশোধনী গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বহাল থাকায় প্রধানমন্ত্রী চাইলে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারতেন এবং সরকার এতদসংশ্লিষ্ট ক্ষমতা ভোগ করতে পারতেন। কিন্তু চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতির নামে এক ব্যক্তির স্বেচ্ছাচার কায়েমের পর থেকে ১৯৯০ অবধি কেবল রাষ্ট্রপতির একেবারে ব্যক্তিগত ও একক ইচ্ছাতেই এ আইনের ও ক্ষমতার প্রয়োগ চলেছে। ১৯৭৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদউল্লাহ কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব কর্তৃক প্রতি স্বাক্ষরিত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছাতেই রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা জারী হয়েছিল। এটাই *ইমার্জেন্সী পাওয়ার্স এ্যাক্ট ১৯৭৫* বা এ্যাক্ট নাম্বার ওয়ান অফ নাইনটিন সেভেনটি ফাইভ নামেও পরিচিত।[৯] অতঃপর এই জরুরী অবস্থা রাষ্ট্রপতি খন্দকার মুশতাক, রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সায়েম এবং রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়ার ব্যক্তিগত ইচ্ছানুযায়ী বেশ ক'বছর চালু ছিল। জরুরী অবস্থা ঘোষণা ২৭শে নভেম্বর ১৯৭৯ তারিখে রাষ্ট্রপতি জিয়া কর্তৃক প্রত্যাহার করা হয়।[১০] যদিও শেষোক্তরা মুজিব ও আওয়ামী লীগ সরকারের একটানা সমালোচনা করেছেন এজন্যে। অথচ তারাও ১৯৭৩ সালের দ্বিতীয় সংশোধনী ও জরুরী অবস্থা ক্ষমতার সুযোগ নিয়েছেন। ১৯৮৭ সালের নভেম্বরে কেবল ব্যক্তিগত ইচ্ছায় জরুরী অবস্থা জারী করে জেনারেল এরশাদও অনুরূপ সুযোগ নিয়েছে। ১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বরেও জেনারেল এরশাদ তার সামরিক নিয়ন্ত্রণাধীন স্বেচ্ছাচারী শাসনকে অভূতপূর্ব গণ অভ্যুত্থানের মুখে টিকিয়ে রাখার জন্যেই জারী করেছিল জরুরী অবস্থা এবং বাতিল করেছিল মৌলিক অধিকার। কাজেই আপাতদৃষ্টে পরস্পরবিরোধী হলেও শ্রেণী ও গোত্রগত স্বার্থের সাযুজ্যের কারণে একের পর এক সকল সরকার জরুরী অবস্থা আইনের সুযোগ নিয়েছে। এছাড়া গদীনসীন রাষ্ট্রপ্রধান ও অন্যান্যদের ব্যক্তিগত স্বার্থের তাগিদ তো ছিলই।

যাহোক, দ্বিতীয় সংশোধনীর ফলে সংবিধানে সংযোজিত ৯-ক ভাগের ১৪১ক ধারা অনুযায়ী, যদি রাষ্ট্রপতির কাছে এটা সন্তোষজনকভাবে মনে হয় যে যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ

বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা এর কোনো অংশের নিরাপত্তা বা আর্থনীতিক জীবন বিপদের মুখোমুখি, তাহলে তিনি জরুরী অবস্থা জারী করতে পারবেন। বিপদ এসে যাচ্ছে মনে করলে রাষ্ট্রপতি বাস্তবে যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগ শুরু হবার আগেই জরুরী অবস্থা জারী করতে পারেন। ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী চর্তুথ সংশোধনী মারফৎ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত এরকম ঘোষণার বৈধতার স্বার্থে তাতে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি স্বাক্ষর লাগতো। এরূপ জরুরী অবস্থার ঘোষণা জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করার কথা এবং সেটা সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত না হলে ১২০ দিনের অধিক বলবৎ থাকুবে না। অবশ্য যদি সংসদ অধিবেশন না থাকে বা এরকম ঘোষণার ১২০ দিনের ভেতর সংসদ ভেঙে যায়, তাহলে সংসদ পুনর্গঠনের পর সেটার প্রথম অধিবেশনের তারিখ থেকে ৩০ দিনের ভেতর ঘোষণাটি সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। সেটা ব্যতিরেকে ওই ৩০ দিনের পরই ঘোষণাটি আপনাতেই অকার্যকর হয়ে যাবে। চালু জরুরী অবস্থা নতুন কোনো ঘোষণা দিয়ে উঠিয়ে নেয়া যাবে।

৯-এর ক ভাগের নব সংযোজন অনুযায়ী ১৪১খ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংবিধানের তৃতীয় ভাগের আওতাধীন বিধানসমূহ দ্বারা রাষ্ট্রের আইন তৈরি ও শাসনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত ক্ষমতার ব্যাপারে যে বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছে, জরুরী অবস্থা জারী থাকাকালে ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ এবং ৪২ ধারার ব্যাপারে সেসব নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নয়। ওই ধারাগুলো অনুযায়ী সংবিধানে উল্লিখিত চলাচলের স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা, বাক্ স্বাধীনতা. পেশার স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি মৌলিক অধিকারসমূহ বিপর্যস্ত করে জরুরী অবস্থা জারী থাকাকালে আইন তৈরী করা যাবে, নির্বাহী ব্যবস্থা নেয়া যাবে। জরুরী অবস্থা বাতিলের সাথে সাথে অবশ্য সরকারের এহেন ক্ষমতা লোপ পাবে। জরুরী অবস্থা উঠিয়ে নেয়ার পর সে সময় প্রণীত কোনো আইন যেটুকু মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী, ততটুকু অকার্যকর হবে। কিন্তু জরুরী অবস্থা জারী থাকার সময় ওই আইনের বলে রাষ্ট্র বা সরকার যা কিছু করেছে বা করেনি, সেসব কিছুই অবৈধ হবে না। এর মানে হল, সরকার জরুরী অবস্থা জারি থাকার সময় মৌলিক অধিকার বিরোধী যেসব কাজ করেছে বা করবে সেসবের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেয়া চলবে না, কোর্টের কাছে যাওয়া যাবে না, প্রশ্ন তোলা যাবে না, বিচার পাওয়া যাবে না। ১৪১ গ ধারাতেও এ ব্যবস্থাকে আরো ব্যাখ্যা করে সরকারের ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো, সাংবিধানিকতা এবং সাংবিধানিক সরকারের ধারণা ও বাস্তব কার্যকারিতার সঙ্গে উল্লিখিত পরিস্থিতি স্পষ্ট বৈপরিত্য রচনা করে।

লক্ষণীয় যে, ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে জরুরী অবস্থা জারীর বিধান ছিল না। তবে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার স্বার্থে এর ৬৩ ধারার (২) এবং (৩) উপধারায় কিছু বিধান ছিল, যা গণতন্ত্রের সঙ্গে বিশেষ কোনো অসঙ্গতি স্থাপন করেনি। দ্বিতীয় সংশোধনী অনুযায়ী ৬৩ ধারার (২) ও (৩) উপধারাদ্বয়কে অবলুপ্ত করা হয় এবং এর পরিবর্তে ৯-ক ভাগের

অধীনে ১৪১ক, ১৪১খ এবং ১৪১গ ধারাত্রয় সংযোজন করা হয়, যে কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। মূল সংবিধানের বিলুপ্ত ৬৩ ধারার (২) উপধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নিয়ে বাংলাদেশের রক্ষা ও প্রতিরক্ষার স্বার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারতেন। কিন্তু ১৯৭৩ সালের দ্বিতীয় সংশোধনী অনুযায়ী সংযোজিত ৯-ক ভাগে প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছায় রাষ্ট্র পরিষ্কারভাবে জরুরী অবস্থা জারীর ক্ষমতা পান। ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারীর পর থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত এ ক্ষমতা একচ্ছত্রভাবে ও স্বেচ্ছাচারী পন্থায় ভোগ করছেন কেবলই রাষ্ট্রপতি। কেননা ওই সময় থেকে চতুর্থ সংশোধনী বলে পার্লামেন্টারী সরকারের পদ্ধতি বদলে ফেলে প্রেসিডেনশিয়াল সরকার কায়েম করা হয়েছে এবং রাষ্ট্রপতিকে অত্যন্ত বেশী স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা দেয়া হয়ে গেছে। আবার, বাতিলকৃত ৬৩ ধারার (২) উপধারা ও (৩) উপধারা অনুযায়ী কেবল যুদ্ধ, বাইরের আক্রমণ বা সশস্ত্র বিদ্রোহের সময় জাতীয় সংসদ তার অধিবেশনে না থাকলে তৎক্ষণাৎ সংসদের অধিবেশন ডাকতে হতো। সংসদ ঠিক করতো যে বহিরাক্রমণ বা সশস্ত্র বিদ্রোহজনিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে কি-না এবং অতঃপর সেসব হলে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে পারতো সংসদ। তাছাড়া, ১৯৭২ সালের আদি সংবিধানের ৬৩ ধারার (২) ও (৩) উপধারাদ্বয় অনুযায়ী আর্থনীতিক সঙ্কট মোকাবেলার জন্যে কোনো বিশেষ আইনের সুযোগ ছিল না। সঙ্কটের সময় রাষ্ট্র বা সরকার জনগণের মৌলিক অধিকারও স্পষ্টভাবে নস্যাৎ করতে পারতো না। সে ব্যাপারে কেবল বলা হয়েছিল যে, জননিরাপত্তা নিশ্চিত ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে অভিব্যক্ত সংসদের বিধিবদ্ধ কোনো আইনকে এ সংবিধানের কোনো কিছুই অবৈধ করবে না।

কিন্তু এসবের বিপরীতে ১৯৭৩ সালের দ্বিতীয় সংশোধনী নব সংযোজিত ১৪১ক ধারার মাধ্যমে যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ ছাড়াও অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের কারণে বা আর্থনীতিক সঙ্কট মোকাবেলা করার নামেও জরুরী অবস্থা জারী করা যায়। আবার, বর্তমান সংসদের কোনো অধিকার নেই উল্লিখিত অবস্থাগুলো সত্যি সত্যি দেখা দিয়েছে কি-না, তা যাচাইয়ের। কেবল রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতীয়মান হলেই হবে এবং এমনকি এগুলি না হলেও চলবে। যদি কেবল রাষ্ট্রপতি এসব সংঘটনের হুমকি অনুভব করেন, তাতেই যথেষ্ট কারণ ঘটবে জরুরী অবস্থা জারীর। এখন এ জাতীয় বিধান যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও তা টিকিয়ে রাখার পক্ষে কত বেশী ক্ষতিকর, তার প্রমাণ ঔপনিবেশিক পাকিস্তান আমলে এদেশবাসী পাবার পরও আওয়ামী লীগ রসকার সংবিধানে জরুরী অবস্থার বিধান সংযোজন করে। পাকিস্তান আমলে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে এহেন বিধান জারী করার পূর্বেই ১৯৩৫ সালের আইন দেখিয়ে গোলাম মোহাম্মদ এবং ইস্কান্দার মীর্জা জরুরী ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছিলেন।[১১] অথচ বাংলাদেশে এ অধিকারই রাষ্ট্রপতিকে দেয়া হল এবং ১৯৭৫ সালের চতুর্থ সংশোধনীর পর থেকে এই ক্ষমতা তিনি এককভাবে ভোগ করেছেন। যাহোক, বর্তমান বাংলাদেশে সংসদের অনুমোদন ছাড়াই ১২০ দিন বা তারও বেশী জরুরী অবস্থা চালু রাখা সম্ভবপর। ১৯৭৪ সালের শেষ দিকে জারী করা জরুরী অবস্থা দীর্ঘদিন স্থায়ী ছিল। ১৯৮৭ সালের ২৭

নভেম্বরেরটাও দীর্ঘদিন চলেছে। সর্বশেষ ১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বর জারী করা জরুরী অবস্থা ৪ঠা ডিসেম্বর গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এরশাদের উৎখাতের পরই কেবল বাতিল করা সম্ভব হয়েছে। জেনারেল এরশাদ ১৯৮৭ এবং ১৯৯০-এ দু'বারই জরুরী অবস্থা চাপিয়ে দিয়েছিল সামরিক নিয়ন্ত্রণাধীন স্বীয় গণবিরোধী চরম স্বেচ্ছাচারী শাসনকে টিকিয়ে রাখার জন্যে। ১৯৮৭ এবং ১৯৯০ দু'বারই এরশাদ মৌলিক অধিকার হরণ করেছে; সভা-সমাবেশ, মিছিল-ধর্মঘট-হরতাল নিষিদ্ধ করেছে; মতপ্রকাশ, সংবাদপত্র প্রকাশনার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে। রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করেছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ করেছে। এসব অমান্য করলে জেল-জরিমানাসহ কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। কারফিউ দিয়ে দেখা মাত্র গুলির হুকুম জারী করেছে। এবং বাস্তবে এরশাদ এসব অত্যাচার সীমাহীনভাবে করেছে। একদিকে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করেছে এরশাদ, অন্যদিকে বলেছে রাষ্ট্রের স্বার্থে জনগণের নিরাপত্তার প্রয়োজনে জরুরী অবস্থা জারী করা হয়েছে। এর ফলে মৌলিক অধিকার ধ্বংস হয়েছে, গণতন্ত্র দিকচিহ্নহীন হয়ে পড়েছে; এমতাবস্থায় সাংবিধানিক সরকারের কথা উচ্চারণ করাটাও কত রূঢ় নির্মম প্রহসন, তা সহজেই অনুমেয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, ভারতীয় সংবিধানে জরুরী অবস্থা জারীর বিধান থাকলেও ১৯৭৭ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জরুরী অবস্থা জারী করায় শেষাবধি গণরোষের মুখে গদীচ্যুত হয়েছিলেন। অন্যদিকে তৎকালীন পাকিস্তানে ১৯৬২ সালের স্বেচ্ছাচারী সংবিধান অনুযায়ী পঁয়ষট্টি সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় থেকে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ওই যে জরুরী অবস্থা চাপিয়ে ছিল, সেটা আর তোলা হয়নি দীর্ঘদিন। বাংলাদেশের জনগণের গণসংগ্রামের বিরুদ্ধে সেটা কেবলই সংকীর্ণ ও হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশেও ১৯৭৪ সালে জারী করা জরুরী অবস্থা আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর এর কঠোর সমালোচনা করা সত্ত্বেও মুশতাক, সায়েম, জিয়া সরকার স্ব স্ব সংকীর্ণ ব্যক্তিক ও গোত্রীয় স্বার্থে জরুরী অবস্থা বহাল রাখে। ১৯৮৭ এবং ১৯৯০ সালে এরশাদ সরকার কর্তৃক একই উদ্দেশ্যে জরুরী অবস্থা জারী হয়েছিল গণআন্দোলন ও অভ্যুত্থানের মুখে।

লক্ষণীয় যে, ১৯৭৩ সালের দ্বিতীয় সংশোধনী মারফৎ জরুরী অবস্থা জারীর বিধান করার পর এবং *স্পেশাল পাওয়ারস এ্যাক্ট, প্রিন্টিংএ্যান্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স* চাপিয়ে দেবার পর থেকে আজ অবধি প্রতিটি সরকার এসব কালাকানুনের চরম অপব্যবহার করেছে স্বীয় সংকীর্ণ স্বার্থে। হাজার হাজার বিরোধী নেতা-কর্মী-প্রতিবাদী বুদ্ধিজীবীর ওপর নিপীড়ন করা হয়োছে, তাদেরকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে, মৌলিক অধিকার নস্যাৎ করা হয়েছে, সংবাদপত্র নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেই ১৯৭৫ এর পূর্বেও *'অবজারভার'* পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক আবদুস সালামকে পদচ্যুত করা হয়, *'গণকণ্ঠ'*, *'লাল পতাকা'* ও *'হক কথা'* পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং *'হলিডে'* সম্পাদককে গ্রেফতার করা হয়। ওই সময় সংবাদপত্রের ডিক্লেয়ারেশন বাতিল

অধ্যাদেশও জারি করা হয়।[১২] আবার ১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ পর্যায়েও দেখি দৈনিক '*বাংলার বাণী*', দৈনিক '*খবর*', সাপ্তাহিক '*যায় যায় দিন*' সাপ্তাহিক '*রোববার*' সাপ্তাহিক '*একতা*', সাপ্তাহিক '*দেশ বন্ধু*' সাপ্তাহিক '*বিচিন্তা*', সাপ্তাহিক '*জয়যাত্রা*', সাপ্তাহিক '*প্রহর*', সাপ্তাহিক '*ইত্তেহাদ*', ইত্যাদি পত্রিকা নিষিদ্ধ করা হয়।'*সচিত্রসন্ধানী* সহ আরো কোনো কোনো পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করা হয়। আবার কোন কোন পত্রিকার ওপর '*কারণ দর্শাও*' নোটিশ জারী করা হয়। গ্রেফতার ও দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয় '*যায় যায় দিন*' সম্পাদক শফিক রেহমানকে, '*বিচিন্তা*' সম্পাদক মিনার মাহমুদকে গ্রেফতার করা হয়। এভাবে ১৯৭৩ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে পুরো সময়টা জুড়ে বারংবার গলা টিপে ধরা হয় গণতন্ত্রের। যদিও পূর্বসূরী মুজিব সরকারকে পরের সব ক'টি সরকার স্বৈরাচারী ও গণতন্ত্র হত্যাকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছে, তথাপি তারা সবাই কমবেশী একই দোষে দোষী এবং একইভাবে চিহ্নিত। '*বিশেষ ক্ষমতা আইন*' নামক কালাকানুনটির সেকশন ১৮তে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সব ক'টি সরকার মত প্রকাশ, সংবাদপত্র ও প্রকাশনার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে, যখনই তারা নিজেদের শাসনকে অনিরাপদ দেখতে পেয়েছে।

৬. রাষ্ট্রে ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় স্থবিরতা ও সংকট

এভাবে ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে গৃহীত দ্বিতীয় সংশোধনীর ভেতর দিয়েই ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে প্রদত্ত বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক অধিকারের মর্যাদাকে হুমকির সম্মুখীন করা হয়। এতে করে প্রকৃত প্রস্তাবে মৌল রাষ্ট্র পরিচালনার আইনমালা হিসেবে সংবিধানের সর্ব প্রধান্য বিনষ্ট হয়। সুযোগ এসে যায় স্বেচ্ছাচারী অবস্থায় জনতার মৌলিক অধিকারকে বিপর্যস্ত করার, তাদের প্রকৃত স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার। সংবিধান ও মৌলিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা বিশেষত সুপ্রীম কোর্টের কার্যকারিতাও অস্বীকৃত হয়। গণতন্ত্রের ওপর তাই প্রথম নিষ্ঠুরতম আঘাত আসে সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে। যদিও আপাতদৃষ্টে সেটা তখনও জনসমক্ষে তেমন স্পষ্ট হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে ১৯৭৪ সালে দেশে জরুরী অবস্থা জারী করা এবং আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর মুশতাক, সায়েম এবং জিয়ার সরকার কর্তৃক সেটাকে প্রলম্বিত করা এবং ১৯৮৭ ও ১৯৯০ সালে এরশাদ সরকার কর্তৃক পুনরায় জরুরী অবস্থা জারীর মাধ্যমে জনগণের মৌলিক অধিকারকে বিপর্যস্ত ও নস্যাৎ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী সংবিধানের যে চতুর্থ সংশোধনী চাপিয়ে দিয়ে জনগণের মৌলিক অধিকারকে নস্যাৎ করা হয়, সংবিধানের প্রধান স্তম্ভ তথা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা হয়, সরকার পদ্ধতিতে অগণতান্ত্রিক পরিবর্তন এনে স্বেচ্ছাচার কায়েম করা হয়, সেটার জন্যে সুযোগ সৃষ্ট হয়েছিল ওপরে আলোচিত দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে। অতঃপর ১৯৭৯ সালে জিয়ার পঞ্চম সংশোধনী, ১৯৮৭ সালে এরশাদের সপ্তম সংশোধনী এবং ১৯৮৮ সালে এরশাদের অষ্টম সংশোধনী গ্রহণ করে প্রথমত, সংবিধান,

দ্বিতীয়ত, এর অধীনস্থ মূল নীতিমালা ও রাষ্ট্রাদর্শ, তৃতীয়ত, জনগণের মৌলিক অধিকার এবং সর্বোপরি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে নস্যাৎ করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও রাজনীতিক ব্যবস্থা আর সাংবিধানিক সরকার গড়ে তোলার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। প্রতিষ্ঠা করা হয় সংবিধানের নামে ব্যক্তিক ও গোত্রগত স্বেচ্ছাচার। সামরিক আইন ও শাসন চাপিয়ে দেয়া, *'প্রোক্লেমেশন'* ও ফরমান দ্বারা সংবিধান সংশোধন করা সহ যাবতীয় স্বেচ্ছাচারিতার ও অপকর্মের হোতা সামরিক স্বৈরতন্ত্র এভাবেই সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করে বাংলাদেশ রাষ্ট্রে। সাংবিধানিকতা, প্রকৃত গণতন্ত্র, মৌলিক অধিকার, মৌল নীতিমালার ঐকমত্য ও জনস্বাধীনতা এভাবেই নস্যাৎ হয়।

কাজেই স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে যে সংবিধান তৈরি করা হয়েছিল চারটি মৌল রাষ্ট্রীয় নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে এবং উক্ত সংবিধানে মৌলিক মানবাধিকার, স্পষ্ট ব্যক্তি সম্মতি ও জনস্বাধীনতা সাপেক্ষে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো ও সাংবিধানিক সরকার গড়ে তোলার যে সুযোগ ও সম্ভাবনা নিহিত ছিল, তা স্পষ্টতই সংবিধানের ওপর মারণাঘাতরূপী সংশোধনীগুলোর মাধ্যমেই ধূলিসাৎ করা হয়েছে। আর এ প্রক্রিয়া স্পষ্টত শুরু করা হয়েছে ১৯৭৩ সালের দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে এবং তা পূর্ণতা পেয়েছে ১৯৭৫ সালের চতুর্থ সংশোধনীর পথ ধরে বিশেষ করে ১৯৭৯ সালের পঞ্চম সংশোধনী, ১৯৮১ সালের ষষ্ঠ সংশোধনী, ১৯৮৬ সালের সপ্তম সংশোধনী এবং ১৯৮৮ সালের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে। তাই বিগত প্রায় ২০ বছরে প্রতিষ্ঠিত বেসামরিক-সামরিক সরকারগুলো এবং এক সময়কার সরকার পরিচালনাকারী প্রধান তিনটি দল (আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং জাতীয় পার্টি) এবং সকল কালের শাসকগোষ্ঠীর আজ্ঞাবাহী ক্ষুদে উপদল ও তাদের তথাকথিত নেতাদের মুখে সংবিধানের পবিত্রতা ও মর্যাদা, সংবিধানসম্মত কর্মকান্ড তথা সাংবিধানিকতা বা সাংবিধানিক সরকারের কথা মানায় না। এরা সবাই যখন জনগণের মৌলিক অধিকার ও সম্মতির কথা বলে, যখন বলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তোলার কথা, তখন সবাই না হলেও সচেতন ব্যক্তি মাত্রই সেসবের অন্তঃসারশূন্যতা উপলব্ধি করেন। জনতাকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে স্ব স্ব ব্যক্তিক ও গোত্রীয় স্বার্থ হাসিল এবং শেষ বিচারে নিজেদের শ্রেণীক অবস্থান ও স্বার্থ টিকিয়ে রাখা ও পরিপুষ্ট করাই যে এসবের পেছনকার প্রকৃত উদ্দেশ্য, তা লুকনো যায় না কোনোমতেই। কেবল ব্যাপক মেহনতি জনতা এসব জটিল বিষয়াদি খুব সহজে বুঝতে পারে না, এই যা রক্ষা। তবে ১৯৯০-এর গণ অভ্যুত্থানের মূল চেতনাকে বিনষ্ট করা এবং ১৯ নভেম্বর ১৯৯০-এর তিনজোটের যৌথ ঘোষণার মর্মার্থ ও শর্তাদিকে বানচাল করার মধ্যে দিয়ে আজকের বাংলাদেশের রাজনীতিতে স্বার্থপর পক্ষ-বিপক্ষ সবার চরিত্র আবারো উন্মোচিত হয়ে পড়েছে।

লক্ষণীয় যে, ১৯৭৩ সালের দ্বিতীয় সংশোধনী থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সম্পাদিত বাংলাদেশ সংবিধানের অগণতান্ত্রিক, মৌলিক অধিকার হরণকারী, মূলনীতি ও

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনাশকারী এবং সেনা স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠাকারী সংশোধনীগুলো ১৯৯০ সালের এত বড় গণঅভ্যুথান ও স্বৈরাচারী এরশাদের পতন এবং নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ ও নতুন সরকার গঠনের পরও বাতিল করা হয়নি। অথচ এই সংশোধনীগুলোই গণতন্ত্র ধ্বংস করে সংবিধান ও রাষ্ট্রকে স্বেচ্ছাচারী করে তুলেছে। এরশাদ–বিরোধী আন্দোলনের সময় ১৯ নভেম্বর ১৯৯০ তারিখে রচিত আন্দোলনরত তিনজোটের যৌথ ফর্মূলায় সকল কালাকানুন বাতিলের স্পষ্ট ঘোষণা ছিল। আরো ছিল অসাংবিধানিক পথে ক্ষমতা দখলের পন্থা চিরতরে বন্ধ করে দেয়ার ঘোষণা। কিন্তু এখন সেসব যেন বিস্মৃতির অতলে। তাই ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন যেমন খালেদা জিয়ার বর্তমান সরকার ও সংসদ বাতিল করতে প্রকৃতপক্ষে আগ্রহী নন, তেমনি তারা সম্ভবত আগ্রহী নন দলীয় সংকীর্ণ স্বার্থ ও একগুঁয়েমী ত্যাগ করে সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীসহ অন্যান্য স্বেচ্ছাচারী সংশোধনীসমূহ বাতিল করতে। তারা এখন সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার নামে গণঅভ্যুথানের মাধ্যমে উৎখাতপ্রাপ্ত জেনারেল এরশাদের অবৈধ শাসনের সকল জের ও সংশোধনীসমূহ টিকিয়ে রেখেছে। অথচ একদিকে তারা আওয়ামী লীগ শাসনামলের স্বেচ্ছাচার, ১৯৭৪ এর বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৫ এর চতুর্থ সংশোধনী, এরশাদের নয় বছরের স্বেচ্ছাচার ইত্যাদির সমালোচনা করছে, অন্যদিকে তারাই আবার আওয়ামী লীগ, পূর্ববর্তী বিএনপি সরকার ও এরশাদের জাতীয় পার্টির সরকারের দুষ্কর্মকে টিকিয়ে রাখছে।

এদিকে আওয়ামী লীগ বিরোধী দলের অবস্থানে থেকে বর্তমান শাসক খালেদার বিএনপি'র সমালোচনা করলেও এবং জনগণের অধিকার, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের কথা বললেও আজও তারা ঘোষণা দিচ্ছে যে, চতুর্থ সংশোধনী পর্যন্ত বাতিল করে সংবিধানকে গ্রহণ করতে হবে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা খুবই স্পষ্টভাবে পত্র–পত্রিকায় বক্তব্য রেখে ডিফেন্ড করছেন ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনকে – একবার নয়, বারংবার। তাহলে দেখা যাচ্ছে, দ্বিতীয় সংশোধনী, বিশেষ ক্ষমতা আইন, এরশাদ শাসনামলের অপকীর্তি ও স্বেচ্ছাচার ইত্যাদিকে মেনে নিয়ে, টিকিয়ে রেখে কেবল মুখে গণতন্ত্র, সাংবিধানিকতা, মৌলিক অধিকার ও জনস্বাধীনতার কথা উচ্চারণ করাটাই ১৯৯০–এর গণঅভ্যুথানের পরও নব্য শাসকগোষ্ঠী ও বিরোধী দল উভয়েরই কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার ও বিরোধী উভয় পক্ষই চাইছে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার নামে দ্বিতীয় সংশোধনীসহ অগণতান্ত্রিক সংশোধনীগুলো, দু'টি সামরিক স্বেচ্ছাচারের দুষ্কর্ম, বিশেষ ক্ষমতা আইন ইত্যাদি বহাল রেখে ওপরে ওপরে পরিবর্তনের লোক দেখানো বক্তব্য রেখে কার্যত স্বেচ্ছাচারী সামরিক আমলাতান্ত্রিক গণবিরোধী রাষ্ট্র কাঠামো টিকিয়ে রাখতে। কেননা এতে করে সামরিক আমলাতান্ত্রিক গোষ্ঠী ও লুটেরা পুঁজির ন্যায় রাজনীতিক মহাজন চক্র হিসেবে তাদেরও সংকীর্ণ স্বার্থ সর্বাধিক হাসিলের বিষয়টি নিরাপদ ও নিশ্চিত হচ্ছে।

৭. উপসংহার

কাজেই বাংলাদেশে প্রকৃত গণতন্ত্র তথা মৌলিক অধিকার, জন স্বাধীনতা ও স্পষ্ট ব্যক্তি সম্মতি প্রতিষ্ঠা করার জন্যে; গণতান্ত্রিক সংবিধান ও রাষ্ট্র কাঠামো সৃজনের জন্যে ১৯৭২ সালের সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীসহ পরবর্তী সব ক'টি সংশোধনী বাতিল করা দরকার। আরো দরকার ঐতিহ্যিক স্বেচ্ছাচারী শাসন ব্যবস্থার বদলে দায়িত্বশীল জবাবদিহিমূলক ও জনমুখী সংসদীয় ব্যবস্থার প্রত্যাবর্তন এবং সংসদের স্বেচ্ছাচার দূর করার লক্ষ্যে মৌল ঐকমত্যের বিষয়াদিকে সংসদ কর্তৃক পরিবর্তনের সুযোগ না রাখা, সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্রকে সমপূর্ণভাবে রাজনৈতিক কমান্ডের অধীনে আনয়ন এবং এ ব্যাপারে সংবিধানে নতুন বিধি অন্তর্ভুক্তকরণ। এছাড়া জেনারেল জিয়া কর্তৃক স্বীয় ক্ষমতার স্বার্থে কৃত সেনা আইনের নির্দিষ্ট ধারার সংশোধন ও সংযোজনসমূহ বাতিল করা দরকার। ১৯৭৪ সালের *বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ* সকল কালাকানুন বাতিল করা দরকার। আরো দরকার আর্থনীতিক সমস্যাসহ জনগণের মৌল সমস্যাদির সমাধান লক্ষ্যে পরিকল্পিত ফলপ্রসূ প্রয়াস নেয়া ও সমতার ভিত্ তৈরী করা এবং দেশীয় লুটেরা চক্র ও আন্তর্জাতিক পুঁজির অশুভ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সংগ্রাম পরিচালনা করা।

মনে রাখা দরকার, কেবল ভোটাধিকারের প্রয়োজনেই গণতন্ত্র আসে না, জন স্বাধীনতা নিরাপদ হয় না, ভাত–কাপড় নিশ্চিত হয় না। ১৯৯১–এ ভোটের অধিকার পেয়েও জনগণের ইচ্ছা কালো টাকার কাছে বলি হয়েছে। লুটেরা পুঁজির প্রতিনিধি, এরশাদের দালাল, স্বাধীনতা বিরোধী – এদের অনেকে টাকা ছড়িয়ে নির্বাচিত হয়েছে। তাই প্রকৃত গণতন্ত্র এবং জনগণের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার জন্যে গণতান্ত্রিক সংবিধান, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো, গণতান্ত্রিক শাসন, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি এবং এসবের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সমতার আর্থনীতিক ভিত্ প্রতিষ্ঠার পরস্পর সম্পর্কিত সামগ্রিক প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম পরিচালনা করা সবচেয়ে জরুরী।[১৩] বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীসহ সবক'টি অগণতান্ত্রিক সংশোধনী বাতিল করার ভেতর দিয়ে আজকের দিনের কর্তব্য কর্ম শুরু হতে পারে। গণতন্ত্রের দাবিদার বর্তমান পঞ্চম জাতীয় সংসদ কি এতটুকু সৎসাহস ও স্বদেশপ্রেম দেখাবে এ ব্যাপারে কার্যকর কিছু করার?

তথ্য নির্দেশ

১। তবে বাংলাদেশ সংবিধান নিয়ে সাধারণভাবে একটি আলোচনা দীর্ঘকাল পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। দেখুন – আবুল ফজল হক, "কন্সটিটিউশন মেকিং ইন বাংলাদেশ," *প্যাসিফিক এ্যাফেয়ার্স,* (ইউনিভার্সিটি অব বৃটিশ কলাম্বিয়া, কানাডা) ভলিয়াম ৪৬, নম্বর ১ (স্প্রীং

১৯৭৩)। এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তমান লেখকের প্রবন্ধ এর পরে সংঘটিত বিষয়াদিকে কেন্দ্র করে রচিত।

২। বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্যে দেখুন – হাসান উজ্জামান, ''বাংলাদেশ ১৯৮৯ ঃ রাজনীতিক সঙ্কটের স্বরূপ ও মৌল নীতিমালার ঐকমত্য'', *সমাজ নিরীক্ষণ*, নম্বর ৩৪, (ঢাকা ঃ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নভেম্বর ১৯৮৯) পৃঃ ১–২১।

হাসান উজ্জামান, ''বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও বর্তমান রাজনীতি ঃ স্বরূপ অন্বেষণ ও সমস্যা বিশ্লেষণ'', *বাংলাদেশে সাম্প্রতিকভাবনা* (সম্পাদিত গ্রন্থ), (ঢাকা ঃ অনুশীলন, ফেব্রুয়ারী ১৯৯০) পৃঃ ৭২–৮২।

৩। *দি বাংলাদেশ গেজেট*, এক্সট্রা অর্ডিনারী, ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃঃ ৬৯৩৩–৩৬। ১৯৭৩ সালের ২৪ নং আইনের ২ ধারাবলে সংশোধনী সংযোজিত এবং ১৯৭৩ সালের ১৫ই জুলাই থেকে কার্যকর বলে গণ্য। আরো দেখুন – *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান* (১৯৮৮ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সংশোধিত), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়, ডেপুটি কন্ট্রোলার, (ঢাকাঃ গভর্ণমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, তেজগাঁও থেকে মুদ্রিত, ১৯৯০) পৃঃ ১৮।

৪। *দি বাংলাদেশ* গেজেট, এক্সট্রা অর্ডিনারী,(১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭২) প্রথম খন্ড, পৃঃ ৩৩৯৫–৪৭৬।

৫। বিশদ বিশ্লেষণের জন্যে দেখুন – হাসান উজ্জামান, *সামরিক বাহিনী এবং বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক বাস্তবতা ও রাজনীতি*, (ঢাকা ঃ ধানশীষ প্রকাশনী), প্রথম সংস্করণ ১৯৮৬। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৭; হাসান উজ্জামান, ''বাংলাদেশে চলমান আন্দোলনের স্বরূপ ও জনতার আকাঙক্ষা'' *বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ভাবনা* (সম্পাদিত গ্রন্থ), (ঢাকাঃ অনুশীলন, ১৯৯০) পৃঃ ৬২–৭১; *হাসান উজ্জামান, নয় বছরের সামরিক নিয়ন্ত্রণাধীন শাসন ও সামরিকীকরণ* , (পুস্তিকা), (ঢাকাঃ প্রশাসনিক গবেষণা কেন্দ্র, ৩০৪ লেকচার থিয়েটার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ফেব্রুয়ারী ১৯৯১), পৃঃ ২৪–২৫ এবং ৩২।

৬। ঐ

৭। *দৈনিক বাংলা*, (ঢাকা, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৩)

৮। *দি বাংলাদেশ গেজেট*, এক্সট্রা অর্ডিনারী, (১৫ই জুলাই ১৯৭৩) পৃঃ ৫৯০৭–৮।

৯। *দি বাংলাদেশ গেজেট*, এক্সট্রা অর্ডিনারী (২৮শে ডিসেম্বর ১৯৭৪) পৃঃ ৬৪৪১–৪৭।

১০। *দি বাংলাদেশ গেজেট*, এক্সট্রা অর্ডিনারী (২৭শে নভেম্বর ১৯৭৯), পৃঃ ৩৭১৯।

১১। দ্রষ্টব্যঃ *তমিজ উদ্দিন খানের মামলা*, পিএলডি, ফেডারেল কোর্ট, (১৯৫৫), পৃঃ ২৪০; *আসমা জিলানীর মামলা*, পিএলডি, সুপ্রীম কোর্ট, পৃঃ ১৮৯।

১২। হাসান উজ্জামান, *আওয়ামী লীগ ও বাকশাল ১৯৭২–৭৫* (সিলেটঃ বাংলাদেশ প্রকাশণী, আগষ্ট ১৯৮০), পৃঃ ৫৭।

১৩। বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্যে দেখুন – হাসান উজ্জামান, বাংলাদেশে গণতন্ত্র সমস্যা ও করণীয়, (ঢাকাঃ বুক হাউস, ফেব্রুয়ারী ১৯৯১)।